ভূমিকা

মানুষ যখন বনবাসী ছিল তখন সব কিছুই ভাগ করে নিত। সভ্যতার আলোকে আসার সাথে সাথেই চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে বৈষম্যের সৃষ্টি হল। সমাজে এগিয়ে থাকা, পিছিয়ে থাকা, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি সৃষ্টি হল। সংবেদনশীল মানুষ, কবি বা স্রষ্টারা এগিয়ে এলেন। পিছিয়ে পড়া মানুষদের সুখ- দুঃখ, আনন্দ- বেদনা প্রভৃতি তাদের ব্যথিত করল, ভাবিত করল। সৃষ্টি হল সাহিত্যের পাতায় প্রান্তিক মানুষের জীবনালেখ্য। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অন্যান্য ভাষা তথা বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে আজ অবধি এই বিশ্বায়নের যুগে প্রান্তিক বা অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের প্রসঙ্গ এসেছে নানাভাবে। সাহিত্যিক রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা' অভিধানে বলেছেন – 'অন্ত্যজ-নীচজাতি'। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানে 'অন্ত্যজ' কথার বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'অন্ত্য বর্ণজাত, নীচজাতি, চণ্ডালাদি জাতি, শূদ্র'। সমাজে যারা অন্তেবাসী তারাই অন্ত্যজ বা প্রান্তিক। সমাজের চোখে এরা অপাংক্তেয়, অচ্ছুত। সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে এরা যুক্ত নয়। সমাজে যারা গরীব, খেটে খায়, যাদের পায়ের তলায় মাটি নেই, যাদের বংশ গৌরব নেই, যাদের নাম-যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি নেই, যাদের তথাকথিত শিক্ষা নেই, সমাজে যারা নানাভাবে শোষিত হয়ে চলেছে, সমাজের চোখে যারা ঘৃণ্য, অবহেলিত তারাই 'অন্ত্যজ' বা 'প্রান্তিক'।

কেউ কেউ অর্থনীতির দিক থেকে অন্ত্যজদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে থাকেন আবার কেউ সমাজনীতির দিক থেকে, কেউ জন্মগত দিক থেকে এদের সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। কেউ আবার বলেছেন অন্ত্যজ সমাজসৃষ্ট, মনুষ্যসৃষ্ট। অন্ত্যজরা নিজেদের সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে থাকে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

"ওরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছে হীনকুলে জন্মাপরাধে ওরা সত্যই অস্পৃশ্য। পরবর্তীকালে যখন সমাজসেবার ব্রত নিয়ে ওদের বোঝাতে চেয়েছি যে, অস্পৃশ্যতা মানুষের সৃষ্টি – বিধাতার নয় – তখন ওরা শিউরে উঠেছে, আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছে।" (আমার কালের কথা, তারাশঙ্কর রচনাবলী – ১০ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ৪৭০)

উনিশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দ মুচি, মেথর ও চণ্ডালকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করে তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন শূদ্র জাগরণের। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাসিম সেখ, রামা কৈবর্তদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'রথের রশি' তে প্রান্তিকদেরই জয়গান করেছেন। এই সবের প্রভাবকে নিয়েই বিশ শতকের সূচনা। দেশকে ভালোবাসতে চাইলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। এই মানুষ বলতে তো শুধু উচ্চবর্ণের মানুষ নয়, প্রান্তিক মানুষও পড়ে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, দেশের রাজনীতি, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মালো, রাজবংশী, জেলে, ডোম, কামার, কুমোর প্রভৃতি অন্ত্যজরা মর্যাদার আসনে উন্নীত হল। ফলে এদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা বাড়তে থাকে, সেই ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে-শিল্পে।

বিশ শতকের কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশের বিষয় হয়ে ওঠে ব্রাত্য জীবন ও এই জীবনের সংকট। বিশ শতকের প্রথম থেকেই গল্প উপন্যাসের বৃহত্তর পরিসরে ভিখারি, ফুটপাতবাসী, বস্তিবাসী, কুলি-মুটে-মজুর-মুচি-বাউরি-সাঁওতাল প্রভৃতি ব্রাত্যজনেরা এসে ভিড় করে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের কথা। এঁদের মধ্যে রয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ। এঁরা সমাজের নিচুতলার মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা- আকাঙ্খা, কামনা-বাসনাকে সাহিত্যের বিষয় করে তুললেন। এরপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিমান লেখক হিসেবে প্রান্তিক মানুষদের কথা বললেন। অন্ত্যজজীবনের আলেখ্য রচনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাউরি, বাগদি, কাহার, ডোম, বেদে, জেলে, লেট, ভল্লা, কোরা, লোহার, মুচি, মেথর, চামার, সাঁওতাল প্রভৃতি বহু বিচিত্র অন্ত্যজ মানুষ তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কথাকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিহারের লবটুলিয়া অঞ্চলের ব্রাত্যসমাজের জীবনচিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষগুলির প্রতি তাঁর মমত্ব ও সহানুভূতি গোপন থাকেনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের জন্য কলম ধরেছেন। এরপর বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন সমাজের নানান প্রান্তিক মানুষদের তুলে আনলেন সাহিত্যের পাতায়।

এর পরেই অন্ত্যজ বা প্রান্তিক মানুষদের জীবনকে আশ্রয় করে বিশ শতকের সত্তর উত্তর কথাশিল্পীরা রচনা করলেন বহু গল্প-উপন্যাস। কোনো একজন দুই জন কথাশিল্পী নন এই সময় পর্বে বিরাট সংখ্যক লেখকদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, যাঁদের সাহিত্য সাধনার একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে অন্ত্যজজীবন ভাবনা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – মহাশ্বেতা দেবী

(১৯২৬-২০১৬)অভিজিৎ সেন (১৯৪৫), ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭), তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭), আবুল বাশার (১৯৫১), নলিনী বেরা (১৯৫১), সৈকত রক্ষিত (১৯৫৪), রামকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৫৬) প্রমুখ।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। কলকাতার বউবাজার লেবুতলা পার্কের নিকটস্থ লেডি ডাফরিন হাসপাতালে। পিতা রামাঙ্গমোহন মুখোপাধ্যায় ও মাতা কনকলতা দেবী। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংখ্যা আট এবং ছোটোগল্প প্রায় আশি। এছাড়া তিনি '*নতুন চীনে*' ও '*ওই বাংলায়*' নামক দুটি ভ্রমণ কাহিনিও রচনা করেছেন। তাঁর অসামান্য প্রবন্ধ- সমালোচনা সাহিত্য '*শতাব্দী শেষের গল্প*', '*বাঙালি সংস্কৃতির আয়তন*', '*আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য*' ও '*গদ্য সংগ্রহ*' । রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে মূলত বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা উঠে এসেছে। এই মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তাই তাঁর সাহিত্যে প্রান্তিক মানুষেরা একাধারে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বাস্তবোচিত ও অন্যদিকে বিশ্বাসযোগ্য। ফলে তাঁর কল্পিত চরিত্ররাও এসে পৌঁছান মাটির কাছাকাছি।

আমরা গবেষণার কাজটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি যথাক্রমে –

প্রথম অধ্যায় : প্রান্তিকতা ও বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক প্রসঙ্গ। এখানে প্রান্তিকতা বলতে ঠিক কি বোঝায় ও তার শ্রেণি বিভাগ করে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, আধুনিক সাহিত্য, কল্লোল যুগের লেখকদের রচনায় কিভাবে প্রান্তিক মানুষেরা উঠে এসেছে তার বর্ণনা রয়েছে। পরে বিশ শতকের আটের দশকে রামকুমার মুখোপাধ্যায় সমসাময়িক এক ঝাঁক কথাসাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসে কিভাবে প্রান্তিক মানুষেরা এসেছে তা চিত্রিত হয়েছে। অধ্যায় পরিশেষে এসেছে আমাদের আলোচ্য কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য। এই অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের আটটি উপন্যাস ও যেসব উল্লেখযোগ্য গল্পে প্রান্তিক মানুষেরা উঠে এসেছে সেই সব গল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য রচনা নিয়ে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি। এই অধ্যায়ে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্ট প্রান্তিক মানুষদের সমাজ ও সংস্কৃতির কথা উঠে এসেছে। এই সমাজের মানুষের পালা-পার্বন, ছড়া, ধাঁধা, ব্রতকথা, নানা গান প্রভৃতির কথা উঠে এসেছে।

চতুর্থ অধ্যায় : প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম। এই অধ্যায়ে অত্যন্ত বাস্তব ভাবে প্রান্তিক মানুষদের জীবন সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। 'চারণে প্রান্তরে', 'ভাঙা নীড়ের ডানা', 'দুখে কেওড়া', 'মিছিলের পরে' প্রভৃতি উপন্যাসে ও 'কর্ণ', 'সম্পর্ক', 'জ্যোতিষী', 'সন্ধান', 'হস্তান্তর', 'মৌজা ডোমপাটি', 'হাভাতে' ইত্যাদি গল্পে আমরা এই প্রান্তিক মানুষদের জীবন সংগ্রামের প্রকট রূপটি প্রতিভাত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : প্রান্তিক মানুষের চরিত্র চিত্রণ। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল বাঁকুড়ার গেলিয়া গ্রামে। তাই গ্রামের নানান বর্ণের, পেশার মানুষদের খুব কাছ থেকে তাঁর দেখার সুযোগ হয়েছিল। এছাড়া নানা পালা- পার্বন- অনুষ্ঠান ইত্যাদির সাথে সাথে গ্রামীণ রাজনীতি প্রভৃতির সাক্ষী ছিলেন তিনি। তাঁর এই বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর সৃষ্ট নানা চরিত্র ও আখ্যান। এই অধ্যায়ে রামকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত গল্প-উপন্যাসে প্রান্তিক চরিত্ররা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভের উপসংহারে বাংলা সাহিত্যে নানা ভাবে প্রান্তিক প্রসঙ্গ থেকে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসে কিভাবে প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা উঠে এসেছে তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। এঁদের মধ্যে থেকে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্ট প্রান্তিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রতা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।